এই শহরে কেউ থাকে না

সাজিন আহমেদ বাবু

তাম্রলিপি

এই শহরে কেউ থাকে না
সাজিন আহমেদ বাবু

গ্রন্থস্বত্ব : লেখক

প্রথম প্রকাশ : ফেব্রুয়ারি ২০২৩

তাম্রলিপি : ৭০৪

প্রকাশক
এ কে এম তারিকুল ইসলাম রনি
তাম্রলিপি
৩৮/৪ বাংলাবাজার, ঢাকা–১১০০

প্রচ্ছদ
চারু পিন্টু

বর্ণবিন্যাস
তাম্রলিপি কম্পিউটার

মুদ্রণ
মা প্রিন্টিং প্রেস

মূল্য : ৩০০.০০

Ei Shohore Keo Thake Na
By : Sajin Ahmed Babu
First Published : February 2023 by A K M Tariqul Islam Roni
Tamralipi, 38/4 Banglabazar, Dhaka-1100

Price : 300.00 $7

ISBN : 978-984-97496-9-1

উ ৎ স র্গ

এই শহরের শেষ দেয়ালে যখন আমার পিঠ ঠেকে যায় তখন কেমন করে যেন এই দুজন মানুষ দেয়াল ভেঙে আমার পথ চলাটা মসৃন করে দেয়। বন্ধু হুসাইন শাহ্ নেওয়াজ ও বন্ধু অনিন্দ্য মামুন।

লেখকের বক্তব্য

এই শহরে এত মানুষ, এত বন্ধু-বান্ধব, পরিচিতজন, আপনজন। তবুও প্রায়শই এত ফাঁকা লাগে কেন! কেন মনে হয় এই 'শহরে কেউ থাকে না।'

সদ্য বিবাহের পর নঁওগা থেকে রিতা স্বামীর সাথে ঢাকায় এসে নিজেকে সবচেয়ে সুখী মানুষ মনে করছে। বাংলাদেশ ভারত বর্ডার তার বাড়ির কাছে হওয়ায় বর্ডার ক্রস করে ভারতে বেশ কয়েকবার যাওয়া হলেও ঢাকা কখনো আসা হয়নি। ছোটোবেলা থেকেই ব্যাপারটা তাদের কাছে এমন ছিলো ঢাকা অনেক দূর। সবুজ অরণ্য ছেড়ে অতিশব্দের শহর ঢাকা এসে ভালোই লাগছে রিতার। উঁচু নিচু দালানগুলো একটু অগোছালো লাগছিলো এই যা।

লম্বা ছিপছিপে গড়নের কালো বর্ণের মেয়ে রিতা। নারকেলি চোখ। নারকেলের সাদার মধ্যখানে যেন কালো বৃত্ত। চোখ দুটো যেন কাজল পড়ার জন্যই সৃষ্টি করা হয়েছে। জন্মের পর থেকে চোখের প্রশংসা এত শুনেছে যে কালো হওয়ার দুঃখ ঘুচে গেছে রিতার। আয়নার সামনে গেলে চোখ দুটোই দেখে বারবার। আড়চোখে তাকিয়ে নিজের চোখকে নিজেই দেখে। ছোটো বেলায় বুড়ো দাদি-নানিরা বলতো গরুর চোখ। এটা যে প্রশংসা ছিলো সেটা রিতা বুঝতে পেরেছে বড়ো হয়ে। রিতা ঢাকায় আসতে পারাতে যে খুব খুশি হয়েছে তা নয়। সবার চোখের আড়াল হতে পারার কারণেই সে মূলত খুশি। একদম নিজের মতো করে সিদ্ধান্ত নিতে পারবে। মনের ইচ্ছার কথা প্রকাশ করতে পারবে।

নাহ রিতার বিগত জীবনে তেমনটা ছিল না। সাড়ে তিন বছর বয়সে রিতার মা রিতাকে তার বাবার কাছে রেখে একজনকে ভালোবেসে তার সাথে গোপনে চলে যায়। গ্রামের ভাষায় যা ছিলো স্বামী সন্তান রাইখা অন্য বেটার লগে ভাইগ্যা গেছে। এই অপবাদ নিয়ে বড়ো হতে হয়েছে রিতার। বাবা চার মাস পর বিয়ে করে নতুন মা ঘরে আনলেও রিতার জন্য তা সুখের ছিল না তেমন। বলা যায় অবহেলা অনাদরেই বেড়ে উঠেছে সে। তবে মাঝে মধ্যে রিতার বাবা মতিউর সাহেব ভীষণ আদর করতেন মেয়েকে। মা বলে

ডাকতেন, খেয়েছে কি না খোঁজ নিতেন। যদিও সে খেতে দেখেছে তাও এই কথাটিই জিজ্ঞেস করতেন। রিতা প্রথম দিকে অবাক হলেও অনেক পরে বুঝতে পেরেছে কোনো কারণে হয়তো মা হীন বেড়ে ওঠা মেয়েটার জন্য তার খারাপ লাগছে। মায়া হচ্ছে তাই কাছে ডাকা। বাবা এভাবে কাছে ডাকলে রিতার কান্না পেতো। কিন্তু রিতা কাঁদতো না। চোখের ভেতরেই পানি ছলছল করতো। এভাবেই চোখের ভেতর পানি নিয়ে খেলার চমৎকার কৌশল আয়ত্ত্ব করতে পেরেছিল রিতা। বড়ো বড়ো চোখে পানি জমিয়ে রেখে রিতা যখন তাকিয়ে থাকে কী যে এক অদ্ভুদ মায়া ভর করে তার উপর!

অবশেষে যখন সবাইকে ছেড়ে স্বামীর হাত ধরে যখন ঢাকা আসছিলো তখন বাবা আর এগারো বছরের সৎ ভাইটার জন্য মায়া হচ্ছিল ভীষণ। এর মাঝে যখনই মনে হলো আজ থেকে আমি স্বাধীন। আমাকে আর কেউ অবহলো করার সুযোগ পাবে না সাথে সাথেই যেন তার মনটা ভালো হয়ে গেলো। দুই রুমের ছোটো একটা ফ্ল্যাট রিতার। ভাড়া সাত হাজার টাকা। বাসাটা বেশ পছন্দ হয়েছে রিতার। সম্পূর্ণ নিজের একটি বাসা।

রিতার স্বামীর নাম স্বপন আহমেদ। সে একটু কায়দা করে নিজের নাম রাখে আহমেদ স্বপন। এটা নাকি বেশ স্মার্ট লাগে। স্বপনের বাবা-মা'র সাথে স্বপনের সম্পর্কটা ভালো না। তাদের সাথে স্বপনের মতের বেশ অমিল। স্বপনের বাবা রাজনীতির সাথে জড়িত। স্বপনের বাবা চেয়েছিলেন তার অফিসের বসের মেয়ের সাথে ছেলের বিয়ে দিবেন। কিন্তু স্বপন সে বিয়েতে সম্মতি না দেয়ায় বাবা মায়ের চক্ষুশূল হলো স্বপন। ধীরে ধীরে বাবার সাথে দূরত্ব বাড়তেই থাকে। এক দিন বাবা স্বপনকে শুনিয়ে শুনিয়ে বলে–

'যে সন্তান বাবার অবাধ্য হয় সেই সন্তানের বাবার সংসারে না থাকলেই হয়। মোরদ থাকলে নিজে কামাই করে খাক।'

স্বপন তখন ডাইনিং টেবিলে বসে খাচ্ছিলো। বাবার মুখ থেকে কথাটা শুনে খাবার আর মুখে দিতে পারলো না। সে ওই অবস্থাতেই খাবার রেখে ওঠে গেলো। বাবা মা দুজনেই স্বপনের খাবার রেখে ওঠে যাওয়া দেখেও কিছুই বললো না। স্বপন রুমে দরজা আটকে ঝিম ধরে বসে রইলো। নিজের জন্মদাতা পিতা নিজের সন্তানকে খাবাররত অবস্থায় এভাবে অপমান করতে পারে! তাও একটা অন্যায় আবদার না শোনার জন্য। তার সাথে বেমানান বসের মেয়েকে কোন স্বার্থে তার সাথে বিয়ে দিতে চাচ্ছে সেটা স্বপন ভালো

করেই বুঝে। একমাত্র মেয়ের নামে যে বিশাল সহায় সম্পত্তি রেখেছে বাবা, আর সেই সম্পত্তির লোভে পরেছে স্বপনের বাবা। স্বপনের চোখ ভিজে উঠছে; বারবার বুকটা ফেঁটে যাচ্ছে। খুব অপমান বোধ হচ্ছে। স্বপনের বাবার সাথে সম্পর্ক দূরত্বটা বেশ অনেক বছর ধরেই। এখন সেটা চূড়ান্ত রূপ নিল। স্বপন জামা কাপড় গুছিয়ে বের হয়ে গেল বাবা মায়ের চোখের সামনেই। কেউ কিছু বললো না, যেন ওর চলে যাওয়ার অপেক্ষাতেই ছিল। বাসা থেকে বের হয়ে স্বপন কলেজ জীবনের এক বন্ধু নাছির উদ্দীনের মেসে ওঠে। নাছির উদ্দীনের সহযোগিতায় একটা চাকরিও পেয়ে যায় স্বপন। কিন্তু চাকরি হয় নঁওগাতে। বাধ্য হয়ে ঢাকা ছেড়ে নওগাঁতে চলে যায় স্বপন। সেখানে পাঁচ বছর চাকরি করার সুবাদে স্থানীয় মানুষদের সাথে সম্পর্ক তৈরি হয়। সেখানকার স্থানীয় তার কলিগ হোসেন ভাইয়ের ঘটকালিতে রিতার সাথে বিয়ে হয় স্বপনের। স্বপন সত্য বলেই বিয়ে করেছে। তার বাবা মায়ের সাথে সম্পর্ক ভালো না এবং সেজন্যই সে নওগাঁ এসে চাকরি করতে বাধ্য হচ্ছে সবই বলেছে স্বপন। সব জেনে শুনেই রিতাকে বিয়ে দিয়েছে রিতার বাবা। তবে স্বপনের কাছে বাবা-মা ছাড়া বিয়ে দেওয়ার বড়ো একটা কারণ হলো বিয়ে দিতে কোনো টাকা পয়সা খরচ হবে না। কারণ স্বপনের কোনো চাওয়া পাওয়া নেই। রিতার সৎ মা তার বাবাকে এক বাক্যে বলে দেয় রিতার বিয়ে এখানেই হবে। রিতার বাবার কী সাধ্য তার কথার অমত করার।

বিয়ের পরের সপ্তাহেই স্বপন ঢাকায় অন্য একটা কোম্পানিতে বিশ হাজার টাকা বেতনে চাকরির অফার পায়। বিয়েতে যেন তার ভাগ্য খুলেছে। সে বিয়ের দুই সপ্তাহ পর রিতাকে নিয়ে ঢাকায় চলে আসে এবং অফিসের পাশে দুই রুমের একটি ফ্ল্যাট নেয়। শুরু হয় রিতা এবং স্বপনের শহর জীবন।

রিতার বাসার পেছনেই বড়ো এক লেক। তার পরেই বোটানিক্যাল গার্ডেনের অরণ্য সমারোহ। স্বপন সকাল আটটায় ফ্যাক্টরিতে চলে যায়। সারা দিন রিতা বাসায় একা থাকে। দিনে বারান্দায় দাঁড়িয়ে বালি হাঁস আর নানা রকম পাখিদের মাছ ধরা দেখে। একটা মাছ ধরতে পারলে উড়াল দিয়ে বোটানিক্যাল গার্ডেনের গাছে চলে যায়। একদম শেষ পর্যন্ত তাকিয়ে থাকে রিতা। ছুটির দিনে এক দিন বিকেল বেলা বারান্দায় দাঁড়িয়ে স্বপনের কাছে রিতা আবদার করে বলে–

'পাখিগুলো মাছ নিয়ে যে গাছগুলোতে বসে সেই গাছের নিচে আমাকে এক দিন নিয়ে যাবে? সেই গাছের নিচে হাঁটবো। পাখিদের কিঁচিরমিচির

শুনবো আর যদি গাছের তলায় মাছের কোনো কাটার অবিশষ্ট পাই বাসায় নিয়ে আসব স্মৃতি হিসেবে।'

স্বপন বললো–'ওটা বোটানিক্যাল গার্ডেন। ওখানে অনেক যুবক যুবতীরা প্রেম করতে যায়। ঠিক আছে তোমাকে এক দিন নিয়ে যাবো। তার পাশেই চিড়িয়াখানা। সেখানেও নিয়ে যাবো।'

রিতার ঢাকাবাসের পাঁচ মাস হয়ে গেলো। দিনগুলো স্বপ্নের মতো কাটছে। যদিও দিনের বেশিভাগ সময় বারান্দাতেই কাটে পাখিদের সাথে তবুও কোনো একঘেয়েমি নেই রিতার। নভেম্বর মাস শেষের দিকে হওয়ায় কিছুটা শীত শীত অনুভব হচ্ছে। রিতার মনে হয় পাখিরা তার সাথে কথা বলে।

আজ নভেম্বরের পঁচিশ তারিখ। কাল রাতেই দারুণ একটা সুসংবাদ বহন করে চলছে রিতা। রিতা কনসিভ করেছে। রিতা স্বপনের খুশির সীমা নেই। স্বপনের আজ ফ্যাক্টরিতে যেতে একদমই ইচ্ছে করছিলো না। কিন্তু ইমার্জেন্সি থাকায় যেতে হলো। রিতা বারান্দায় প্লাস্টিকের চেয়ারে বসে আছে। খুশির মাঝে থেকে-থেকে মনটা খারাপও হয়ে যাচ্ছে। এখনো বাবা মাকে খবরটা জানানো হয়নি। জানালে তারা খুশি হবে নাকি খরচ হতে পারে ভেবে অখুশি হবে সেটা নিয়ে দ্বিধা দ্বন্দে আছে রিতা। এটা ভেবেই থেকে-থেকে মন খারাপ হচ্ছে। তাই জানায়নি কাউকে।

স্বপন সন্ধ্যার পর প্রতিদিন বাসায় ফিরে জিজ্ঞেস করে, 'আব্বাকে বলেছো?' রিতা প্রতিদিনই ভুলে যাওয়ার ভান করে বলে, 'নাহ কাল বলবো।' এভাবেই সাত দিন কেটে গেলো। স্বপন তো আর শশুড়কে এই খবর দিতে পারে না। অতঃপর এক দিন ছুটির দিনে স্বপনের কথায় বাধ্য হয়েই রিতা তার বাবাকে কল দিয়ে প্রতিবেশী রেশমী খালাকে চাইল। রেশমী খালার মাধ্যমে প্রেগন্যান্ট হওয়ার সংবাদটা বাবাকে জানালো। পরবর্তীতে রেশমী খালার কাছ থেকেই জানতে পেরেছিলো বাবা অনেক খুশি হয়েছে। পরের দিন বাবা ফোন দিয়ে রিতাকে বললো–'দেখি মা আমি একটু সময় বের করতে পারলে তোকে দেখতে আসব।'

রিতা খুব ভালো করেই জানে বাবা আসতে চাইলেও মা কখনোই তাকে আসতে দিবে না। আজ পাঁচ মাস হয়ে গেলো রিতা বাড়ি ছেড়ে চলে আসছে এক দিন পারল না আসতে মেয়েকে দেখতে। অথচ রিতা জন্মের পর থেকে

কখনো বাড়ির বাইরে ছিল কি না মনে করতে পারে না। এই প্রথম বাবাকে দেখে না পাঁচ মাস হয়ে গেলো। রিতা মেনে নিয়েছে এটাই মেয়েদের জীবন। পরিবারের সবাইকে ছেড়ে এক দিন দূরে চলে আসতে হয়।

প্রেগন্যান্সির ছয় মাস চলছে রিতার। স্বপনেরও ফ্যাক্টরিতে কাজের চাপ বেড়েছে। প্রমোশন পেয়ে ম্যানেজার পদে উন্নতি হওয়ায় কাজের প্রেশার বেড়েছে অনেক। আড়াই শ' জন কর্মচারী তার আন্ডারে। প্রতিদিন বাসায় ফিরতে রাত নয়টা-দশটা বেজে যায়। রিতার পক্ষে এখন সংসারের কাজ করা অসম্ভব হয়ে উঠছে। তার উপরে সারা দিন বাসায় একা থাকা রিস্কের ব্যাপার। বিপদ আপদ তো বলা যায় না। এটা নিয়ে ভালোই টেনশনে থাকে স্বপন।

শেষ তিন মাস ধরে স্বপনের মায়ের সাথে স্বপনের যোগাযোগ হচ্ছে। স্বপনের ফ্যাক্টরির এক কর্মচারী স্বপনের এলাকার সে স্বপনের মা'কে স্বপনের কথা বলেছে এবং মোবাইল নাম্বারও দিয়েছে। তারপর থেকে তার মা মাঝে মধ্যেই কল দেয়। বহুবার ছেলেকে বউ নিয়ে বাড়িতে উঠতে বলেছে কিন্তু স্বপন বাবার সামনে যেতেই রাজি হয়নি। গত ষোলো দিন ধরে স্বপনের মা তার বাবার সাথে রাগ করে তার ছোটো মামার বাসায় অবস্থান করছে। বিষয়টা আজই জানতে পারলো স্বপন। তখন মাকে বললো –

'মা তুমি কয়টা দিন আমার বাসায় এসে থাকতে পারবা? তোমার বউমার জন্য কাজ করা খুব রিস্কি হয়ে যাচ্ছে।'

স্বপনের মা সাথে সাথেই রাজি হয়ে গেলেন। কারণ ভাইয়ের বাসায় খুব একটা ভালো ছিলেন না সে। ভাইয়ের বউ বিষয়টা ভালোভাবে নিচ্ছিলেন না। প্রায় প্রতিদিনই বলতো 'জামাইর সাথে রাগ করা ঠিক না। মানুষটার খাওয়া দাওয়া সমস্যা হচ্ছে। তুমি চলে যাও।' এর অর্থ দাঁড়ায় তুমি এই বাসায় এতদিন কী করো? চলে যাও।

প্রায় সাত বছর পর মায়ের সাথে দেখা স্বপনের। বাসার ঠিকানা দেখে নিজে নিজেই সিএনজি নিয়ে চলে এসেছে স্বপনের মা রাবেয়া বেগম। ছেলেকে দেখে হুড়মুড়িয়ে কেঁদে ওঠেন রাবেয়া। স্বপন খুব কঠোর হয়ে ছিলো কাঁদবে না। কিন্তু মায়ের কান্না স্বপনকেও প্রভাবিত করে। স্বপনও কাঁদে। পাঁচ মিনিটের মধ্যে রাবেয়া বেগমের কান্না শেষ। একের পর এক বাবার বদনাম করেই যাচ্ছে। স্বপন মাকে থামিয়ে দিয়ে বললো–

'মা বাদ দাও না ওসব কথা। তোমার বউমার সাথে কথা বলো।' সাথে সাথেই রাবেয়া আগের বিষয় থেকে বের হয়ে রিতাকে জড়িয়ে ধরলেন। রিতা তার এই মুহুর্মুহু পরিবর্তন দেখে কিছুটা অবাক হলেও শাশুড়িকে পেয়ে সে ভীষণ খুশি। মায়ের আদর যে অধরা রিতার কাছে। শুরু হলো বউ শাশুড়ির সংসার। রাবেয়া বেগম বউয়ের ভালোই সেবা যত্ন করে। সারা দিন বউ শাশুড়ির গল্প করে। কাজ করার সময়ও গল্প চলতেই থাকে। ধীরে ধীরে সৎ মায়ের সংসারে বেড়ে ওঠা রিতার সকল কিছুই জানতে পারলো। শুধু রিতাকে রেখে রিতার মায়ের চলে যাওয়াটা রিতা এড়িয়ে গেলো। পুরোপুরি এড়িয়ে যায়নি, রিতা বলেছে ছোটো বেলায় বাবা মায়ের বনিবনা না হওয়ার কারণে ছাড়াছাড়ি হয়ে যায়। মা তাকে নিতে চেয়েছিলো কিন্তু বাবা দাদা-দাদি কেউই দেয়নি। মাকে ছোটো না করার জন্য বিষয়টা ঘুরিয়ে বলেছে তা নয়, সত্যটা বললে পরবর্তীকালে তার অনেক কথা হজম করতে হবে। সেই ভয়েই এই সত্যটা লুকিয়ে যায় রিতা। তবে এটাও সত্য; মাকে সে ছোটো করতে চায় না। মায়ের প্রতি তার এক সমুদ্র অভিমান থাকলেও অন্যের কাছে মাকে ছোটো করতে পারে না।

ডাক্তারের কথা মতে আর সাতাশ দিন পর রিতার ডেলিভারি। শেষ তিন দিন ধরে মাকে স্বপ্ন দেখছে রিতা। রিতা তার মাকে শেষ দেখেছিল অষ্টম

শ্রেণির বৃত্তি পরীক্ষা দিতে গিয়ে। পরীক্ষার কেন্দ্র যেখানে পড়েছিলো সেই এলাকাতেই রিতার মায়ের শ্বশুড় বাড়ি। পরীক্ষা শেষ হওয়ার কিছুক্ষণ আগে থেকে মা নিলুফা খাতুন প্রতিদিন স্কুলের পাশে এসে দাঁড়িয়ে থাকতেন মেয়েকে দেখার জন্য। শেষ পরীক্ষার দিন রিতার বাবা নিতে আসতে পারেননি। ঐ দিনই নিলুফা খাতুন মেয়ের সামনে যেতে পারলেন। নিলুফা খাতুন মেয়েকে বুকে জড়িয়ে অঝোরে কাঁদলেন। রিতার চোখে পানি ছিল না। কেমন যেন খাঁখাঁ চোখে তাকিয়ে ছিল রিতা। মা রিতার হাতে পাঁচশ টাকা গুজে দেন। রিতা নিতে চায়নি। মায়ের জোরাজুরি দেখে মোসলেম শেখ নিতে বললেন। তখন রিতা টাকা নেয়। রতন শেখের মেয়ে আর রিতা এই দু'জনই স্কুল থেকে বৃত্তি পরীক্ষা দিতে এসেছিলো। বাড়ি ফেরার পর মায়ের জন্য ভীষণ কান্না পাচ্ছিলো রিতার।

এত বছর পর মাকে স্বপ্নে দেখে মায়ের জন্য কান্না পাচ্ছে রিতার। ভীষণ মায়া হচ্ছে মায়ের জন্য। চোখ ভিজে আসছে। না আবার শাশুড়ি দেখে ফেলে তাই রুম থেকে বারান্দার দিকে পা বাড়াল তখনই রিতার মোবাইল বেজে উঠলো। ফোন হাতে নিয়ে দেখে বাবার ফোন। রিতার মনটা নাচন দিয়ে ওঠে।

'হ্যাঁলো বাবা'

'মারে কেমন আছিস?'

'ভালো আছি বাবা। তোমরা কেমন আছো?'

'মারে আমি তোর কাছে আসতেছি। ট্রেনে আছি। ট্রেন এখন গাজিপুর।'

রিতার কোনো কথা বলতে পারছে না। খুশিতে কেঁদেই ফেললো। ধরা গলায় বললো– 'ওকে বাবা আসো।'

পেছনে রিতার শাশুড়ি এসে দাঁড়িয়ে ছিলেন। রিতা চোখ মুছতে মুছতে বললো–

"মা আমার বাবা আসছেন আমাকে দেখতে। ট্রেনে আছে গাজিপুর।'

শাশুড়ি বললেন, 'স্বপনকে একটু জানাও। বাসায় তো বেশি কিছু নাই,ও যেন বাজার করে নিয়ে আসে।'

'ওকে মা।'

রিতা রুম থেকে বের হয়ে ড্রইং রুমে সাবধানে হেঁটে গেলো। বেতের সোফায় বসে স্বপনকে কল দিলো।

নয় মাস পর মেয়েকে দেখতে এলেন বাবা। রিতা বাবাকে জড়িয়ে কেঁদে নিলেন প্রাণ ভরে। বাবাও কাঁদলেন। মেয়ের বাসা দেখে খুশি হয়ে গেলেন বাবা। ঘর সংসার দেখেই বুঝলেন সুখে আছে মেয়ে। বউমা প্রেগন্যান্ট বলে এত বছরের অভিমান ভেঙে শাশুড়ি চলে এসেছেন এর চেয়ে দারুণ আর কী হতে পারে!

শ্বশুড় আসছে শুনে স্বপন সন্ধ্যার আগেই বাসায় ফিরে এলেন দুই ব্যাগ ভর্তি বাজার নিয়ে। মতিউর সাহেব অসহায় মুখ করে জামাই'র সামনে গেলেন। চোখ মুখে রাজ্যের অপরাধ বোধ। নয় মাস পর মেয়েকে দেখতে এসছেন অপরাধ বোধ হওয়াটাই স্বাভাবিক। রিতা বাবার জন্য রান্না-বান্না কিছুই করতে পারল না। শাশুড়ি যতটুকু পারলেন করলেন। বাকিটা কাল রান্না করা হবে। রাতে সবাই এক সাথে খেতে বসলেন। রিতা শরীর নিয়ে ঠিকমতো দাঁড়াতে না পারলেও বাবাকে নিজ হাতে বেড়ে খাওয়ালেন। আর সুযোগ পেলেই শাশুড়িকে জড়িয়ে ধরে বলেন,

'মা আপনি না থাকেল এই মুহূর্তে আমার কী যে হতো।'

শাশুড়ি খুশি হয়ে বলেন, 'আমার শরীরটা বেশি ভালো না, ভালো থাকলে দেখতা কত কিছু করতাম।'

খাওয়া শেষে মতিউর সাহেব বললেন, 'মারে আমি সকাল দশটার ট্রেনে চলে যাবো।'

এ কথা শুনেই রিতা আতঁকে উঠল।

'কী বলো বাবা! তুমি চলে যাবা মানে?'

রাবেয়া বেগম বললো, 'না না ভাই যেতে পারবেন না। আমি তো রান্না-বান্না কিছুই করি নাই। কাল করব বলে।'

স্বপন বললো, 'নাহ আব্বা আপনি কাল কোনোভাবেই যেতে পারবেন না।'

মতিউর সাহেব অসহায় হয়ে বললেন, 'আমি খুব শীঘ্রই আবার আসব। কাল যেতেই হবে। খুব দরকারি কাজ পরে গেছে।'

রিতা আর কিছু বললো না। রিতা বুঝে গেল, বাবা মাকে না জানিয়ে এসেছে। জানালে হয়তো আসতে দিত না। আর জানতে পারলেও অশান্তি হবে সংসারে। রিতার চোখ ভিজে গেলো। মেয়ের চোখের পানি দেখে মতিউর সাহেব আরও অসহায় হয়ে পড়লেন। রিতার বুঝ হবার পর থেকেই ওই মানুষটাকে শুধু অসহায়ই হতে দেখলেন। সে যেন পৃথিবীতে অসহায় হয়েই জন্মেছে।